সকল পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের (২০২১) প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

এই জায়গায় বিজ্ঞাপন দিন মাত্র ৩০০ টাকায় (প্রতি সংখ্যার জন্য)। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (সাদা-কালো) প্রতি কলম সেমি ৫০ টাকা। প্রথম পাতার প্রতি কলম সেমি ৭৫ টাকা।

বর্ষ-৮, সংখ্যা: ২-৩ (যুগ্ম সংখ্যা), এপ্রিল-জুলাই, ২০২১ AANANDA AANGAN বৈশাখ - শ্রাবণ ১৪২৮

অমর শিল্পী সত্যজিৎ রায়

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার

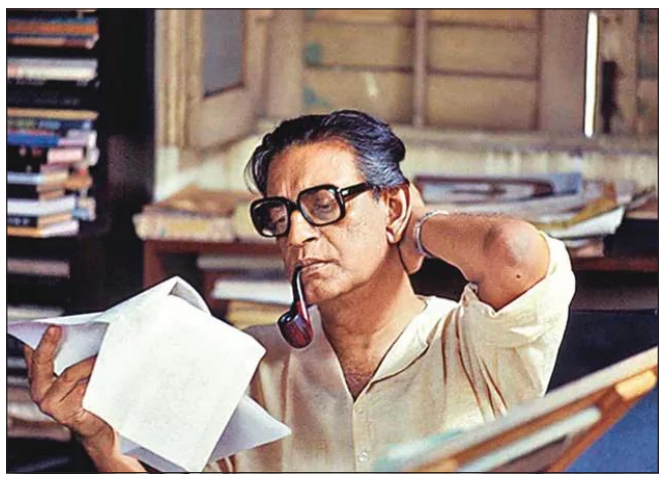

শিল্পকলার প্রায় সব শাখাতেই ছিল যার সফল পদচারণা। সাহিত্য, চিত্রকলা, নাটক ও সঙ্গীতে সত্যজিৎ রায় বিখ্যাত এক শিল্পী। সাহিত্যে ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কুর মতো বিখ্যাত চরিত্র সৃষ্টির স্রষ্টা। তবে তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত তার চলচ্চিত্রকার পরিচয়ের জন্য। বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সৃষ্টিতে সত্যজিৎ রায় ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সত্যজিৎ রায়ের ২৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার প্রয়াত হন। সত্যজিৎ রায় একাধারে চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার, সংগীতজ্ঞ, চলচ্চিত্র সমালোচক, লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক, চিত্রকর ও আলোকচিত্রী। অমর এই শিল্পী সেলুলয়েড এঁকেছেন মানুষের জীবনের নানামুখী উত্থান পতনের ছবি। গল্প বলার ছলে তিনি বলেছেন মানুষের আবেশ, অনুভূতি, কাব্যময়তা, অসহায়ত্ব, মানবিকতা, মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা বেদনার কথা। তার কাছে ক্যামেরা যেন ছিল রং তুলি। আর তা দিয়ে তিনি এঁকেছেন জীবনের বহুমুখী ছবি। জীবনকে দেখেছেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলায়। কটিয়াদির বাড়িতেই জন্মেছিলেন সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও বাবা সুকুমার রায়। তবে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের অনেক আগেই উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ছিলেন একাধারে লেখক, চিত্রকর, দার্শনিক, প্রকাশক ও শখের জ্যোতির্বিদ। বাংলা শিশু সাহিত্যে তার রচনাকর্ম আজও অমর। আর উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে (সত্যজিৎ রায়ের বাবা) সুকুমার রায়ও ছিলেন বাংলা ভাষার একজন নামকরা সাহিত্যিক। সুকুমার বাংলা সাহিত্যের রসময় ধারার অন্যতম প্রবর্তক। ১৯২১ সালের ২ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন সত্যজিৎ রায়। জন্মের মাত্র তিন বছর বয়সেই বাবা সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। মা সুপ্রভা দেবী বহু কষ্টে তাকে বড় করে তোলেন। সত্যজিৎ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতিতে পড়াশোনা শুরু করেন। যদিও চারুকলার প্রতি ছিল তার গভীর দুর্বলতা। ১৯৪০ সালে মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা শেষে সত্যজিৎ কলকাতায় চলে আসেন। পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থা 'ডি জে কিমার'-এ জুনিয়র

এরপর ৪ পাতায়

সুন্দরবন এখন জলছবি

স্বপন মন্ডল
(সমাজসেবী)

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে...।

যেদিকে তাকাই শুধুই জলছবি। প্রায় প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক রোষে সুন্দরবনের অস্তিত্ব ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। আয়লা, আমফান, ইয়াস এবং গত ৫-৬ দিনের প্রবল বর্ষণে মানুষ দিশাহীন। এই কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে আমন ধান চাষের বীজতলা ও সবজি খেত ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুকুর, ডোবা, মাঠ সর্বত্রই জলছবি। সুযোগ বুঝে মিষ্টি জলের মাছ খোলামাঠে উঠে গেছে। কৃষি ও মাছ চাষীর মাথায় হাত। এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে সুন্দরবনের জনবসতি কতদিন টিকে থাকবে সময়ই বলে দেবে। সদ্য কাটা ইয়াসের হানায় হাজার হাজার একর জমি নোনা জলে পতিত হয়ে গেল। মিষ্টি জলের জলাধার বা পুকুরগুলো সাদা মাছ শূন্য, সবজির খেতে সবুজ বলে কিছু নেই, দীনমজুরদের কাজ নেই, ভেঙে যাওয়া অসংখ্য নদী বাঁধ আজও মেরামত হয়নি, কিছু কিছু জায়গায় গ্রামবাসীর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় জোড়াতালি দিয়ে কোনরকম চলছে। সুন্দরবনের এমন দুর্গতি দেখে পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় তাদের সাধ্যমত ত্রাণের ব্যবস্থা করে চলেছেন। তাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও স্বাগত।

যদিও এটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য, তবুও তাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ত্রুটি নেই। আমার মনে হয়, ত্রাণ বন্টন সমবন্টন হয়নি। কারণ কিছু কিছু গ্রাম বা দ্বীপ আছে

এরপর ২ পাতায়

থেমে গেল কলম আধুনিক কবিতার অন্যতম

জনক শঙ্খ ঘোষ এখন তারার দেশে

বাংলা সাহিত্যের একটা যুগ যেন হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল। ২১ এপ্রিল ২০২১ করোনা কেড়ে নিল আরও এক নক্ষত্রকে। সত্যি তো, আকাশের নক্ষত্রের স্থানেই তো আজ থেকে দেখা মিলবে প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষের। বিপ্লব ছিল রক্তে। যা ঝলকে পড়ত লেখায়। কবির লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হত তরুণ সমাজ। পেত এক নতুন বল।

অবিভক্ত বাংলার চাঁদপুরে ১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জন্ম হয় কবির। আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক পাশ করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। পেশা হিসবে বেছে নিয়েছিলেন অধ্যাপনাকে। শিয়ালদহের বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্রিয় ছিলেন শঙ্খবাবু।

দেশভাগের সময় গর্জে উঠেছিল কবির কলম। তারপর বাংলা যখন ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে তখনও থেমে থাকেনি তা। একটার পর একটা কালজয়ী কবিতা উপহার দিয়েছেন পাঠকদের। মধ্যবিত্ত বাঙালির মনন তাঁর মতো করে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। সাধারণের নিজেকে নিয়ে দ্বন্দ্ব, আলো-অন্ধকারে ঘেরা জীবন, প্রবঞ্চনা-ভালোবাসার চেনা ছকই অচেনা হয়ে ধরা দিত তাঁর

সৃষ্টিতে।

কবি শঙ্খ ঘোষ কবিতার পাশাপাশি গদ্যও লিখতেন তিনি। আসলে গদ্য হোক বা পদ্য, শঙ্খ ঘোষের প্রতিটি রচনায় থাকত এক অনন্য রসবোধ, বৈদগ্ধতার পরিচয়। যা পাঠকের মনকে শান্ত করে। নতুন করে ভাবতে শেখায়। সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার জন্ম দেয়।

রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ পরবর্তী সময়ে বাংলা আধুনিক কবিতার পঞ্চপান্ডব ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধায়, বিনয় মজুমদার, উৎপল কুমার বসু এবং শঙ্খ ঘোষ। প্রথম চারজনকে আমরা আগেই হারিয়েছি। আর এবার শঙ্খ ঘোষের বিদায় শেষ হয়ে গেল সাহিত্যের একটা যুগের। 'বাবরের প্রার্থনা', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'উর্বশীর হাসি', 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো কাব্যগ্রন্থ কবি উপহার দিয়েছেন পাঠককে।

'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান তিনি। ১৯৭৭এ 'মূর্খবড়, সামাজিক নয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য পান নরসিংহ দাস পুরস্কার। ১৯৮৯ সালে 'ধুম লেগেছে হৃদকমলে' কাব্যগ্রন্থের জন্য শঙ্খবাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয় রবীন্দ্র পুরস্কার, 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'-এর জন্য পেয়েছিলেন সরস্বতী পুরস্কার। ২০১৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ও ২০১১ সালে ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' সম্মানে সম্মানিত হন শঙ্খ ঘোষ।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষ

'এসো হে বৈশাখ এসো এসো'। অপেক্ষার অবসান শেষ। বৈশাখ ১৪২৮, বাঙালির নতুন বছরের আগমন। সকলকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। ১২ মাসে ১৩ পার্বণ কথাটি বাঙালির এক প্রকারের বিশেষণ। নববর্ষের উদ্‌যাপন দিয়ে পালাপার্বণ পর্বের শুরু।

বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নববর্ষকে স্বাগত জানানোর ধরন পাল্টেছে। বাঙালির সাবেকিয়ানা এখন আধুনিকতার নয়া মোড়কে বাঁধা পড়েছে ঠিকই কিন্তু বাঙালি আজও তার ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে। নববর্ষ পালন শুধু নয় তাকে সাদর আপ্যায়নে আলিঙ্গন করে বাঙালি।

বৈশাখ হল বাংলা নববর্ষ বা নতুন বছর। পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশ 'নববর্ষ' বিশেষ উৎসব হিসেবে পালন করা হয়। আসাম, ত্রিপুরা বাঙালী বসবাসরত জায়গায় এই দিনটি বিশেষ উৎসবের দিন। দেশী প্রবাসী প্রায় সব বাঙালীর কাছে এটা খুশির দিন। নববর্ষ বাঙালিদের একটি সার্বজনীন উৎসব হিসাবে বিবেচিত।

সুন্দরবন এখন জলছবি

১ পাতার পর

যেখানে ভীষণ কম ত্রাণ পৌঁছেছে। এছাড়া স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্ব লোকাল পরিচালকদের মধ্যে কিছুটাতো আছেই।

কিন্তু এইভাবে আর কতদিন...। এর বিকল্প পথ কি? যেভাবে বিশ্বউষ্ণায়ন বাড়ছে স্বভাবত দিনদিন জলস্তর বাড়ছে। নদীতে পলি, বালি জমে, নদী তার নাব্যতা হারাচ্ছে। তাহলে এমন পরিস্থিতি থেকে সুন্দরবনবাসীকে টিকিয়ে রাখার দিশা কে দেখাবে? কোনদিনই কি এর স্থায়ী সমাধানের পথ হবে না। ত্রাণ দিয়ে একদিন, এক সপ্তাহ, একমাস, তারপর ... তারপর ...। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রকৃতিকে আঘাত করলে, প্রকৃতিও পাল্টা আঘাত দেয় যা বোধ করার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। এই বোধ আমাদের কবে হবে। আমার দেখা বাসন্তী থানার চড়াডাকাতিয়া, ভাঙন খালী, নারায়ণতলা, আমড়াতলা, কুমিরমারী ইত্যাদি। এছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের নদীঘেঁষা বসতি এলাকার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তারা দৈনিক, অবাধে নদীর পাড়ে ও নদীর চড়ায় প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে ওঠা ম্যানগ্রোভ গাছ কেটে এনে তার পাতা গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। গাছের ডালপালা, লতানো সবজি গাছের মাচা, অথবা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে, তারপর গাছের গুড়িটা ঘর তৈরির কাজে ব্যবহার করে। অর্থাৎ আমরাই আমাদের গর্ত খুঁড়ছি। আমরা যদি সংশোধন না হই, বিডিও বা প্রশাসন অথবা পঞ্চায়েত কোনদিনই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই আগামী দিন আরও ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে সুন্দরবনবাসীকে বাঁচাতে (১) দরকার সচেতনতা। (২) ম্যানগ্রোভ চারা তৈরির নার্সারী বানানো, সেখান থেকে বিনাপয়সায় ওই চারা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, সংগঠন, ক্লাব ও এস.এইচ. জি. গ্রুপের সহায়তায় রোপন করা। (৩) উক্ত চারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় ক্লাব, সংগঠন ও এস.এইচ. জি. গ্রুপে এবং বেকার যুবকদের সাম্মানিক ভাতা দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া। (৪) কঠোর আইন প্রয়োগ। (৫) শীঘ্রই সমগ্র নদীবাঁধগুলো সর্বোচ্চ জলসীমার চাইতে উঁচু কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করা যে বাঁধের উপর থেকে গাড়ি চলাচল করতে পারবে। (৬) নদীপাড়ের বাইরের দিকে অর্থাৎ লোকালয়ের দিকে পাড়ের গায়ে বা জলে বৃক্ষরোপণ। (৭) নদীর জল ফিশারি বা ভেড়িতে ইনলেট বা আউটলেট হওয়ার গেটপথ বা নিকাশি পথ আরো শক্তপোক্ত করার ব্যবস্থা করা। (৮) অবৈধ ইট ভাঁটা ও ফিশারি বা ভেড়ি অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

আমরা বাইরে থেকে যতই সুন্দরবন উন্নয়নের পরিকল্পনা করি না কেন, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করি না কেন, সুন্দরবনের স্থায়ী উন্নয়ন করতে গেলে, প্রথমেই সুন্দরবনের নদী বাঁধের উন্নয়ন দরকার। নচেৎ সকল উন্নয়ন জলছবি হয়ে যাবে। ইংরেজ আমল থেকে এযাবৎ সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য অসংখ্য পরিকল্পনা রচনা হয়েছে। অগ্রিম আনুমানিক ব্যয় খসড়া তৈরি হয়েছে, সেই খসড়া পাশও হয়েছে। নদী বাঁধের জন্য কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে বলা মুশকিল। তাই উন্নয়নের নাম করে সুন্দরবনকে দেখিয়ে এবার ব্যবসা বন্ধ হোক, আসুন নদী বাঁধে হাত লাগাই। এটা আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গঠনমূলক ভাবনাচিন্তার সমাজ দরদী মানুষ অবশ্যই এ বিষয়ে সমর্থন জানাবেন।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

শিল্পকলা

শিল্পকলা বলতে বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিদ্যমান বহুবিধ কিছু মানব কর্মকান্ডকে বোঝায়, যেগুলিতে দেখা, শোনা বা পড়ার যোগ্য কিংবা পরিবেশন করার মত এমন বিশেষ কোনও কিছুর (বস্তু, পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা) সৃষ্টি করা হয়, যার মাধ্যমে সৃষ্টিকারীর কল্পনা শক্তি বা কারিগরি দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ও বুদ্ধি দিয়ে মানসিকভাবে যার সৌন্দর্য ও আবেগ উদ্রেককারী ক্ষমতার তারিফ করে। শিল্পকলায় সৃষ্ট বস্তুকে শিল্পকর্ম বলে এবং যে ব্যক্তি শিল্পকলার চর্চা করে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন, তাঁকে শিল্পী বলে। কোনও মানব কর্মকান্ড ও তার সৃষ্টিকে শিল্প বলে গ্রহণ করা হবে কিনা, তার প্রায়শই স্থান, কাল, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সম্প্রদায় এমনকি ব্যক্তিগত সৌন্দর্যবোধ ও আবেগ-অনুভূতির ওপর নির্ভর করে। আবার স্থান, কাল, সংস্কৃতির সীমানা ছাড়িয়ে সিংহভাগ মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ ও আবেগকে নাড়া দেয়, এমন শিল্পকর্মও রয়েছে। তবে বিংশ শতাব্দীতে এসে আবেগ ও সৌন্দর্য্যের চিরায়ত সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে সমসাময়িক শিল্পী সমাজ, শিল্পের সমালোচক ও বোদ্ধা সমাজ এবং শিল্পকর্ম ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত যে কোনও কিছুকেই শিল্পের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে, যা সাধারণ জনগণের কাছে দুর্বোধ মনে হতে পরে। শিল্পকলামূলক কর্মকান্ডে পরিধি সতত পরিবর্তনশীল। নতুন প্রযুক্তি, নতুন উপাদান, নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদি নতুন নতুন শিল্পকলার জন্ম দিচ্ছে।

বসন্ত এলো এলো এলরে

তুলসী সরকার

ক্যালেন্ডারের পাতায় উঠে আসার আগেই প্রকৃতি মেতেছে বাসন্তী বাহারে। শীতের আড়মোড়া ভেঙে

চরাচর সেজেছে পুষ্পিত কাননে। নীল চাদোয়ার আকাশ ছড়িয়ে গেছে দৃষ্টির প্রসারিত দিগন্তের ওপারে। চারপাশে মখমল-পেলব বাতাসের দোলায় বেজে উঠেছে স্পন্দিত জীবনের কলতান। প্রকৃতি যেন আগেভাগেই জানিয়ে দিচ্ছে, 'বসন্ত এলো এলো এলো রে'।

এ বছর মাঘের শেষ সপ্তাহেই টের পাওয়া গেছে ফাগুনের চপলতা। না বলেই শীত উধাও হয়েছে বসন্তের মাতাল আবেশে।

গাছে গাছে ফিরে এসেছে চিরায়ত প্রাণের দ্যোতনাভরা সবুজ সবুজের অনাদি বংশধর হয়ে নবরূপে জেগেছে পত্র, পুষ্প, পল্লব।

আনন্দিত সুর ও গানের কল্লোলিত ঝরণাধারায় ডেকেছে পাখির দল।

কখন জানি না, একগুচ্ছ ঝরা পালকের বেদনা রেখে উঠে গেছে সাইবেরিয়ার অতিথি পাখির ঝাঁক। দোসর হারানোর ব্যথাভরা বুকে চলে গেছে তারা স্বদেশে।

শীত থেকে বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির রূপান্তর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকেও প্রবল বদলে দিয়েছে।

গভীরভাবে ছুঁয়ে গেছে বাসন্তী নান্দনিকতা; আলতো পরশ বুলিয়ে দিয়েছে দিন-যাপনের যাবতীয় অনুষঙ্গে। ক্যাম্পাসে- ক্যাম্পাসে, নাগরিক আড্ডায় যুথবদ্ধ পথচলায়, যুগলের পদক্ষেপে, রুচি ও পোশাকে এসে গেছে বসন্ত। ঋতুরাজকে আবাহন করতে জীবন ও যৌবন তারুণ্যের লেলিহান শিখায় জেগে উঠেছে ফাগুনের গানে গানে, ফলে ফলে, রঙে ও গন্ধে।

আটপৌরে নগর-যান্ত্রিকতায় বর্ষা এবং বসন্তের মতো আর কোনও ঋতু সম্ভবত এতোটা শিহরণ জাগাতে পারে না। নগরের চৌকাঠে বর্ষা দৃশ্যত হয়ে যায় কষ্টের বারিধারা। বসন্তই সম্ভবত এখনও পারে বর্ণিলতায় ভরিয়ে দিতে। রঙে, গন্ধে, আলোয়, মলয়ে অসীমান্তিক নৈসর্গিকতায় ভাসিয়ে দিতে পারে জীবনের সীমাবদ্ধতাকে। জীবনের সীমাবদ্ধ বৃত্তকে পরিণত করতে পারে প্রসারিত ভূগোলে।

প্রকৃতির মতোই মানুষও প্রাণ খুলে, মন মেলে অপেক্ষায় থাকে ফাগুনের, বসন্তের। জীবনের সুবিস্তৃত জানালাগুলো বসন্তের বহুবর্ণা ক্যানভাসে একের পর এক খুলে যেতে থাকে। মুছে যায় আবিলতা। উন্মুক্ত হয় প্রতিটি হৃদয়। আনন্দ-উচ্ছল ভালোবাসায় জাগে দিবস, জাগে রজনী, জাগে প্রাণ। শীত থেকে বসন্তে উত্তরণের মাহেন্দ্রক্ষণে সবাই গাইতে থাকে 'বসন্ত এলো এলো এলো রে/ পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহরে/ মুহু মুহু কুহু তানে/ মাধবী নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে/ ভ্রমর গুঞ্জে গুঞ্জে গুনগুন গানে।'

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা / ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

সংযুক্তা কুমারী, বয়স ৯

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০১৯ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অঙ্কন প্রতিযোগীদের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক প্রদান

টিনা দাস, প্রথম, গ্রুপ-এ
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সৌপ্তিক বিশ্বাস, দ্বিতীয়, গ্রুপ-এ
তীর্থঙ্কর আর্ট একাডেমী

সংযুক্তা ভৌমিক, তৃতীয়, গ্রুপ-এ
শিল্পকলা আর্ট স্কুল

অদ্রিজা সরকার, তৃতীয়, গ্রুপ-এ
নবোদয় আর্ট একাডেমী

অদ্রিজা দাস, তৃতীয়, গ্রুপ-এ
প্রান্তিক আর্ট সেন্টার

রেশ্মিকা হালদার, প্রথম, গ্রুপ-বি
বীনাপানি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

শুভজিৎ দেবনাথ, দ্বিতীয়, গ্রুপ-বি
অঙ্কনালয় আর্ট স্কুল

অরীন্দ্র হালদার, তৃতীয়, গ্রুপ-বি
সুচিত্রা আর্ট একাডেমী

পূজা মাঝি, তৃতীয়, গ্রুপ-বি
আদর্শ চিত্রকলা

সৌমিকা মন্ডল, তৃতীয়, গ্রুপ-বি
চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

ইশিতা কর, প্রথম, গ্রুপ-সি
কৃষ্টি দ্য স্কুল অব আর্ট

লোকজিৎ বিশ্বাস, দ্বিতীয়, গ্রুপ-সি
চারুকলা আর্ট স্কুল

সাত্ত্বিক বিশ্বাস, তৃতীয়, গ্রুপ-সি
আঁকন কলা কেন্দ্র

তৃষা ঘোষ, তৃতীয়, গ্রুপ-সি
আকাশ কুসুম আর্ট স্কুল

শান্তনু মালো, তৃতীয়, গ্রুপ-সি
ম্যাডোনা আর্ট স্কুল

শ্রেয়শী মন্ডল, প্রথম, গ্রুপ-ডি
আলোছায়া

শায়মি মজুমদার, দ্বিতীয়, গ্রুপ-ডি
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গৌরাঙ্গ বসাক, তৃতীয়, গ্রুপ-ডি
পামেলা প্রকৃতি প্রণয়ন

মেঘা সাহা ভৌমিক, তৃতীয়, গ্রুপ-ডি
চিত্রকলা কেন্দ্র

জয়শ্রী দাস, তৃতীয়, গ্রুপ-ডি
চারুকলা আর্ট স্কুল

ত্রসরেণুর মতো হালকা

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

(প্রখ্যাত লেখক জ্যোতির্ময় গোস্বামীর 'সমাজযোগ' যা এখনও বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে আগামী দিনে হবে। বহুমুখী স্বরোজগার ও সর্বতোমুখী সবুজায়নে সার্বিক সমাজ যোগ।

সমবায় সাধনার ধারায় পরিবেশ, স্বরোজগার ও কৃষি সংকটের সমাধানে, ছোট একটি নয়া সংযোজন, সমাজের ত্রিবেণী সাধনা। সমাজযোগ কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনের সমন্বয়। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি এখন থেকে আনন্দ অঙ্গন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।)

ছাড়বার মিনিট পাঁচের আগে নিজে চড়তে পারলেও আমস্টারডাম থেকে প্লেন ছাড়ল প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পরে। আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার। ছাড়তে না ছাড়তে অবিলম্বে এসে গেল উত্তর সাগর। এরই কোণে আছে পৃথিবীর বহুদিনের — যাকে বলে, 'কেন্দ্রস্থল'—ইংল্যান্ড। এই দেশটার প্রতি আমাদের আছে একটা তীব্র দ্বৈত-অনুভূতি. অর্থাৎ যতই এই অঞ্চলের মানুষের দুর্বৃত্তির কথা জানা থাক, একটা সমীহ ভাবও রয়ে গেছে এই দ্বীপের অধিবাসীদের প্রতি।

চকিতে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখতে পাওয়া গেল। এই কি সেই হেব্রিডিস দ্বীপ, যার থেকে ভেসে এসেছিল দূরশ্রুত কোকিলের গান? সলিটারি রীপারের কবির কানে?

ভারতে এবং সারা পৃথিবীতেই ইংরেজরা বিপদ ও সম্পদের যুগ্ম প্রতীকরূপে দেখা দিয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাসে আকর্ষণ-জীবিতার এক নয়া অধ্যায় রচনা করেছে এই ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসীরা। কয়লা, তেল, জল---সবেরই ব্যবহার শিখলাম আমরা মূলত এদের কাছেই অথবা এদের মারফতেই। মনে হলো, এইখান থেকেই তো দেখেছি নতুন সভ্যতা শুরুর জন্য আকুলি-বিকুলি। Extinction Rebellion-এর যে আওয়াজ আজ এই 'অগ্রসর' দেশগুলিতে উঠেছে, তাতে হাসি ও কান্না দুই-ই দেখা দেবার মতো পরিস্থিতি। মনে হলো যত বিপদই তুমি ঘটিয়ে থাকো পৃথিবীর, তোমাকে সালাম না করে পারি না।

বিমান ইংল্যান্ডের ভূখণ্ডকে বামে রেখে গ্রীনল্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলল। ততক্ষণে সে চলেছে চব্বিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। মানে এক মেঘ দু মেঘ তিন মেঘ পেরিয়ে প্রায় আট-দশ মেঘ ওপর দিয়ে। এখন নিচে আর দেখা যায় না কিছুই। ওপরে আকাশ, নিচেও আকাশ। মাঝে মাঝে অসম্ভব শাদা মেঘেদের দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক নিচে। তবে মনে হচ্ছে, তারা 'মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুকুমার গোবৎসের মতো' নীলাম্বরে নয়, পৃথিবীরই কোলে শুয়ে আছে। তাও শুধু মনেই হচ্ছে। পৃথিবী নিচের দিকে আছে, এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে আছে বলে। কিন্তু বাস্তব চোখে দেখছি, ওপরে আকাশ, নিচে আকাশ। আকাশের এমন সর্বতোমুখী বিস্তারকে দেখিয়ে দেবার জন্য বিজ্ঞানের বিরাট শক্তিকে খুব করে চোখে পড়ে। কিন্তু সে একটি বারের জন্য। সৃষ্টির শক্তি আর স্রষ্টার শক্তি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল। এক মহাশক্তির বিপুল বিস্ময়করতা, সমস্ত মনকে আশ্রুত করে তুললো। নিজের ওজন তখন আশ্চর্যরকম হালকা হয়ে গেল।

নিজের ভারকে কমানোর জন্য অনেক ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে আফিং-হাসিস-মারিজুয়ানা প্রধান। ধর্মদ্বেষীরা ধর্মকেও এই শ্রেণিভুক্ত করেন। এঁরা অবশ্য ধম্য আর ধর্মামোহ দুটিকে একটু গুলিয়ে ফেলেন। সে যাইহোক, ধর্মের কিন্তু যত গুণই থাক, অনেক সময় অন্যের অভিজ্ঞতাকে মেনে চলার দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয় সে। যা অনেক সময়ই আত্মদীপের দ্বারা আলোকিত নয়। এবোঝা অনেক সময়ই হয়ে ওঠে বিষম বোঝা। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এমন কোনো ভার বা বোঝা নেই। তাই শিল্পী হোন বা সাধক, যাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জেগেছে, তিনি পরম নির্ভার। আর যাঁরা এর কোনোটাই নন, কিন্তু সৃষ্টির বিসয়করতায় অভিভূত, সাময়িকভাবে হলেও, তাঁরাও ভারহীন। সম্ভবত তেমন কোনো সঞ্চয় না থাকায় ভারহীনতার এই বোধে উত্তরণের অভিজ্ঞতা খুব সহজে ঘটে না। কিন্তু আজ নিচে এবং ওপরে উভয়ত আকাশ রেখে ভাসতে ভাসতে কেমন যেন হালকা হয়ে গেলাম আমি। কতোটা যে হালকা সহজে সেকথা বুঝিয়ে বলাই মুশকিল। কতটা যেন মনে হয়, সেই ত্রসরেণুর মতো হালকা, যা অন্ধকার ঘরে ছিদ্রপথে আগত আলোকরেখায় অবলীলায় ভেসে ফেরে।

অমর শিল্পী সত্যজিৎ রায়

১ পাতার পর

ভিজুয়ালাইজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১০৪৩ সালের দিকে তিনি প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট প্রেস'-এর সঙ্গে জড়িত হন। এই প্রকাশনী থেকে বের হওয়া বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকাই ছিল তার কাজ। সিগনেট প্রেস থেকে বের হওয়া প্রচুর বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেন তিনি। যার মধ্যে জিম করবেটের 'ম্যানইটার্স অব কুমায়ুন' ও জওহরলাল নেহেরুর 'দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' উল্লেখযোগ্য। আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র শিশুতোষ সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'ও এই প্রকাশনী থেকে বের হয়েছিল। বইটির প্রচ্ছদ আঁকার দায়িত্ব পড়ে সত্যজিতের উপর। প্রচ্ছদ আঁকার আগে উপন্যাসটি পড়েন তিনি। উপন্যাসটি সত্যজিৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। প্রচ্ছদ আঁকা ছাড়াও তিনি বইটির ভেতরের বিভিন্ন ছবিও এঁকে দেন। পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় 'পথের পাঁচালী'কে বেছে নেন। বইয়ের ভেতরে আঁকা ছবিগুলোই পরে দৃশ্য বা শট হিসেবে তার সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রে স্থান পায়। ১৯৪৭ সালে অন্যদের সঙ্গে মিলে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ফিল্ম সোসাইটি। সোসাইটির কল্যাণে বিশ্বের বহু বিখ্যাত ছবি দেখেন। ছবি দেখতে দেখতেই একসময় ছবি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তবে ১৯৪৮ সালে মুক্তি পাওয়া ইতালির পরিচালক ভিট্টোরিয় ডি সিকার অমর চলচ্চিত্র 'বাইসাইকেল থিফ' দ্বারা চলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হন। ১৯৫২ সালের শেষ দিকে সত্যজিৎ তার নিজের জমানো টাকায় 'পথের পাঁচালী' ছবির দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেন। ভেবেছিলেন প্রাথমিক দৃশ্যগুলো দেখার পর হয়তো কেউ ছবিটিতে অর্থলগ্নি করতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেন নি। তবে তিনি থেমে যান নি। ধীর গতিতে কাজ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ঋণ নিয়ে ১৯৫৫ সালে ছবিটির নির্মাণ শেষ করেন। ওই বছরই ছবিটি মুক্তি পায়। মুক্তির পর পরই ছবিটি দর্শক সমালোচকদের ব্যাপক প্রশংসা পান। কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্টারি' ক্যাটাগরিতে ছবিটি পুরস্কৃত হয়। এছাড়াও ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায় সিনেমাটি। এই ছবির মাধ্যমেই চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘ পথচলার শুরু হয়। আর পরবর্তী ছবি 'অপরাজিত' তাকে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। ছবিটি ইতালির ভেনিসের বিখ্যাত গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার জেতে। এরপর তিনি একে একে নির্মাণ করেন 'অপুর সংসার', 'পরশপাথর', 'জলসাঘর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'চারুলতা', 'দেবী', 'মহানগর', 'অভিযান', 'কাপুরুষ', 'মহাপুরুষ', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ', 'জনারণ্য', 'হীরক রাজার দেশে', 'গণশত্রু', 'আগন্তুক', 'শাখা প্রশাখা', 'সোনার কেল্লা', 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ইত্যাদি। আর ডকুমেন্টারি ফিল্ম, শর্ট ফিল্ম, ফিচার ফিল্মসহ সত্যজিৎ রায় পরিচালনা করেছেন। মোট ৩৭টি ছবি। পথের পাঁচালি থেকে আগন্তুক, দীর্ঘ এক চলচ্চিত্রকারের জীবন তার। সেলুলয়েড আলোছায়ার ব্যঞ্জনায় উপন্যাসের কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনা, দ্বন্দ্ব, সুরের ছন্দকে খুব সাবলীলভাবে সাজাতেন তিনি। ফ্রেমের সুনিপুণ ও নান্দনিক গাঁথুনির ঢংয়ে গেঁথেছেন অমর সব মালা। ফ্রেমে বেঁধেছেন মানুষের জীবন। অমর এই ছবির কবির চলচ্চিত্র ছিল মূল প্ল্যাটফর্ম। শিল্প-সাহিত্যের অন্যসব শাখায়ও ছিল সফল পদচারণা। যেখানে হাত দিয়েছেন দু'হাতে মুক্তো ফলিয়েছেন। লিখেছেন ছোটগল্প। চলচ্চিত্র নিয়েও লিখেছেন বেশ কিছু বই। 'আওয়ার ফিল্মস', 'দেয়ার ফিল্মস', 'বিষয় : চলচ্চিত্র', ও 'একেই বলে শুটিং' বইগুলোতে আজও চলচ্চিত্রে আগ্রহী যে কারো কাছে প্রিয়। চিত্রশিল্পী হিসেবে সত্যজিৎ রায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিজের লেখা সব বইয়ের প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি তিনি নিজেই এঁকেছেন। নিজের চলচ্চিত্রের সব বিজ্ঞাপনও নিজেই তৈরি করতেন তিনি। ১৯৮০ সালে 'ঘরে বাইরে' ছবির কাজ করার সময় সত্যজিৎ রায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়। এতে তার কাজের গতি কমে যায়। প্রায়ই তিনি অসুস্থ থাকতেন। ১৯৯২ সালে আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সত্যজিৎ রায়। এ সময় হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি পেন্সিলে আঁকেন একটি গাছের স্কেচ। যার মধ্যে ছিল উপমহাদেশের ১১ জন বিখ্যাত মনীষীর মুখাবয়ব। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মানজনক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান সত্যজিৎ রায়। একই বছর ভারত সরকার তাকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন প্রদান করে। এছাড়াও জীবদ্দশায় তিনি ৩২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেন। আর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পেয়েছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি। যা প্রথম চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পেয়েছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। ১৯৮৫ সালে ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান।

সাথী বিশ্বাস, স্টুডেন্ট আর্টওয়ে

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা (সি ব্লক), প্লট নং- ৭২১, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com